ফ্যাসিজম ও আগামীর বাংলাদেশ

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

ফ্যাসিবাদের কিছু আদর্শ পুরো জাতির মতামত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেমন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিগত পনেরো বছরে এদেশে। ২০২৪ এর বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'ফ্যাসিবাদ' এখন একটি কমন শব্দ হয়ে উঠেছে। তাদের আলোচনার কেন্দ্রীয় স্থানে 'বৈষম্যবিরোধী' কথাটির সঙ্গে ফ্যাসিবাদের কথা। এই শব্দটি শুধু বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ও এর সহযোগীদের প্রতি ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতিহাসে ফ্যাসিবাদের উৎপত্তিগত ধারণাটি সরল নয় বরং বেশি জটিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর রূপ অনুসন্ধান করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যাসিবাদের চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, খুব দেরি হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষ বুঝতে পারে না যে তারা ফ্যাসিবাদের শিকার হচ্ছে। কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারবে না যে স্পেনে ফ্রান্সিসকো ফ্র্যাঙ্কোর শাসন এবং আর্জেন্টিনায় হুয়ান পেরোনের সরকারই ফ্যাসিবাদের প্রকৃত উদাহরণ এবং সেই শাসন পদ্ধতি চিহ্নিত করা ও ভেঙে ফেলার মাধ্যমেই ফ্যাসিবাদ নির্মূল করা সম্ভব। যদি তাই হতো তাহলে বিশ্ব পরবর্তীতে আবারও ইতালিতে দূর-বামপন্থী সামরিক গোষ্ঠী রেড ব্রিগেডের উত্থান দেখত না।

ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ছিল লাশের মিছিলের উপর দাঁড়িয়ে হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকার উদগ্র বাসনা। শাসকরা যখন স্বৈরশাসক হয়ে ওঠেন, শাসন যখন অপশাসনে পরিণত হয়, ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত হয়, রাষ্ট্রের প্রতিটা বিভাগকে যখন উলঙ্গ দলীয়করণ করা হয়, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত বাহিনীকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা হয়, ভিন্নমতাবলম্বীদের উপর চালানো হয় দমন-পীড়ন ও অমানবিক নির্যাতন, যখন মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়,তখনই মানুষের হৃদয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। জনমনে ক্ষোভ একপর্যায়ে বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে। বুলেট-বোমার তোয়াক্কা না করে গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বস্তরের মানুষ। এটাই ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা। আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করি ঠিকই, কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না।

মহান আল্লাহর চিরন্তন ঘোষণা, 'তুমি বল, হে আল্লাহ! তুমি রাজাধিরাজ। তুমি যাকে খুশি রাজত্ব দান কর ও যার কাছ থেকে খুশি রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। তুমি যাকে খুশি সম্মানিত কর ও যাকে খুশি লাঞ্ছিত কর। তোমার হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান' (আলে ইমরান ৩/২৬)। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো অত্যাচারী শাসকই স্থায়ী হয়নি কোনোদিন হবেও না।

দেশের মানুষ মোট তিনটি অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করেছে। আইয়ুব খার বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারির গণঅভ্যুত্থান, এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বরের গণঅভ্যুত্থান। এরপর দীর্ঘ ৩৪ বছর পর দেখল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থান। ইতঃপূর্বের দু'টি অভ্যুত্থানের চেয়ে ২০২৪ সালের অভ্যুত্থান ছিল অনেক বেশি ভয়াবহ, লোমহর্ষক,নির্মম ও রক্তাক্ত। আইয়ুব খান ও এরশাদ দেশ ছেড়ে পালাননি, কিন্তু হাসিনাকে দেশ থেকে পালাতে হয়েছে। ইতঃপূর্বের অভ্যুত্থানে এতটা রক্তপাত হয়নি, যতটা না হয়েছে ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে। বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ছাত্র-জনতার এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান-এর মধ্যে দিয়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়েছে। গত পনেরো বছর ধরে যারা ছিলেন মহা দাপুটে সংহারী মুহূর্তে হয়ে গেলেন গর্তে লুকানো থরহরি কম্প ইঁদুর। আর ক্ষণকাল পূর্বেও যারা ছিল ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিধ্বস্ত, আশ্রয়হারা নিঃসহায়, হঠাৎ তারাই হয়ে উঠল একেকজন হারকিউলিস। সকালে যারা ছিলেন মহামান্য রাজাধিরাজ, বিকালে তারা হলেন ধিক্কৃত পলায়নপর স্বৈরাচার।

বিগত পনেরো বছর বুকে চেপে বসেছিল দুঃশাসন, বিচারহীনতা, যুলুম-নির্যাতন আর বাকস্বাধীনতা হরণের এক মহা জগদ্দল পাথর। দানবীয় যুগের অন্যতম প্রতীক- দুর্নীতি এবং বৈষম্য। স্বাধীনতার চেতনার নামে হাসিনা এ দেশকে দুই ভাগ করে ফেলেছিল। হাসিনার লোকদের একচ্ছত্র আধিপত্যে বাকিরা ছিল ম্রিয়মাণ। সকল সেক্টর ছিল মহা দুর্নীতিগ্রস্ত। দলীয়ভাবে নিয়োগকৃত অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একেকটা অফিসকে গড়ে তুলেছিল দুর্নীতির আখড়া। ব্যাংকিং সেক্টর ছিল লোপাটের কারখানা। একেকটা ব্যাংককে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল বড়ো বড়ো শিল্পগোষ্ঠী নামক দস্যুদের হাতে।

চব্বিশে ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন পরবর্তী সময়ে হয়ে যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এই আন্দোলন পরে রূপ নেয় অসহযোগ আন্দোলনে। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার রক্তভেজা অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত। সারা দেশে, বিজয় উল্লাস করতে দলে দলে নেমে আসে দেশের সব পেশার সাধারণ মানুষ। এমন উল্লাসের দিনেও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ঐদিন আশুলিয়া বাইপাইল এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয় ১০-১২ জন এর মধ্যে ৭ জন শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয় তাদের মরদেহ একটি পিকআপে তুলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আহতদের হাসপাতালে যেতেও বাঁধা দেয়া হয়েছে, রাস্তায় পরে থাকা আক্রান্তদের ম্যানহোলে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা এমনকি একাধিক গুলি করেও মৃত্যু নিশ্চিত করা পৈশাচিক ইচ্ছা মানতে পারেনি ঐ রিকশা চালক ভাইটি পরম যত্নে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিতে বাঁধা দেয়া, চিকিৎসার জন্য ছুটাছুটি, হাসপাতালে চিকিৎসক নামক কয়েকজন নরপিশাচ আহত ভাইটিকে পায়ের নিচে চেপে ধরে নির্যাতনও করেছে। কত নির্মম ও বীভৎস ঘটনা!

বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোনো আন্দোলনেই এত বিপুল প্রাণহানি ঘটেনি। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের চেয়ে প্রবল ও রক্তাক্ত ছিল এই গণ-অভ্যুত্থান। তাই অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, 'আমরা আরেকবার স্বাধীন হলাম! শিক্ষার্থীরা এত সাহস পেল কীভাবে! কীভাবেই-বা রিকশাওয়ালা থেকে সর্বস্তরের জনতাকে তারা নিজেদের লড়াইয়ে শামিল করতে পারল?' পারল, কারণ তারা কথা বলেছে বাংলাদেশের হৃদয় থেকে।

১৬ জুলাই রংপুরে পুলিশের বন্দুকের সামনে দুই হাত প্রসারিত করে আত্মাহুতি দেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বীরসেনা আবু সাঈদ। আবু সাঈদের মৃত্যু রচিত করেছিল মহাকাব্যের। ইতিহাস সাক্ষী অসীম সাহসী, নির্ভীক আবু সাঈদের মৃত্যু। এই মৃত্যুই গণঅভ্যুত্থানের সূচনা এবং সেদিনই চূড়ান্ত হয়েছিল বিজয়ের । স্থল, নৌ এমনকি আকাশ পথেও ছিল যুদ্ধাস্ত্রের আক্রমণ। রাজপথ ছাড়াও রেহাই পাইনি মায়ের কোলের শিশু, ঘরের মধ্যে থাকা বোনরা, ঘরের ছাদের ওপর খেলতে থাকা শিশু বা বারান্দা দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থী। বিশ্ব দেখেছে এতো মৃত্যুর পরে কীভাবে পুরো দেশের ছাত্র জনতাসহ আপামর মানুষ নেমে গিয়েছিল রাজপথে।

ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে এ গণঅভ্যুত্থানে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে শ্রমজীবী, রিকশাচালক, পথশিশু, মেহনতি সাধারণ মানুষ। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, শিল্পী,অভিনয়শিল্পী আর নানা শ্রেণি-পেশার বিক্ষুব্ধ লাখ লাখ মানুষ। প্রায় দেড় হাজার মানুষ শহিদ হয়েছেন, তার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বাইরে শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ ছিল,আহত হয়েছে ৩০-৪০ হাজার। অসিম ত্যাগ, সাহসিকতা আর দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা হয় 'স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু' অঙ্গীকারে বলীয়ান হয়ে ৫ আগস্ট গণভবন অভিমুখে ছাত্র-জনতার ঢল নামলে হাসিনা সরকারের পলায়ন হয়।

এ গণঅভ্যুত্থান ছাত্র-তরুণদের প্রায় সমগ্র একটি প্রজন্মকে রাতারাতি দায়িত্বশীল করে তুলেছিল। ছাত্র-জনতার বীরোচিত আত্মদান হাজারো, লাখো তরুণকে জুলুম এর বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধের চেতনায় জাগিয়ে তুলেছে। তাদের অনেকের কাছে এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধে শামিল হওয়ার মতো গৌরবের বিষয়। হাজার হাজার তরুণ শিক্ষার্থী, নারী-পুরুষ আবু সাঈদের মতো আত্মদানে গুলির মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ফ্যাসিবাদী শক্তিকে কে পরাজিত করে।

ছাত্র-জনতা আন্দোলনে প্রাণ দিল, তাদের কথা প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে। সফল এই দেশ গঠনের আন্দোলনে শিক্ষার্থী-জনতা যারা ছিল, সবাই আমাদের অহংকার। এই যে সহস্রাধিক প্রাণের বিনিময়ে এবার যে স্বাধীনতা পেলাম, এটা যেন আর নষ্ট না হয়। যথাযথভাবে সবকিছু ব্যবহার করতে পারি। আমরা আর কোনো নৃশংসতা চাই না। আমরা স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে চাই। বলার স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, পড়ার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতাকে কেউ যেন ভন্ডুল না করে। তাহলেই আমরা জাতি হিসেবে এগিয়ে যেতে পারব।

বৈশ্বিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত বাংলাদেশের বৈপ্লবিক রূপান্তরকামী প্রজন্ম। ফ্যাসিবাদী আর কোনো শক্তি যেন আর এই মাটি রক্তাক্ত করতে না পারে, সে ব্যাপারেও তারা সজাগ। এ দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার আসবে, যা হবে নিরপেক্ষ দুর্নীতিমুক্ত এবং একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র গড়ার সহায়ক । জনগণ একটি সুন্দর বাংলাদেশ পাবে। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলা,রাজনীতিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে কর্মসূচি হবে জনকল্যাণকর। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন হবে। এই বাংলাদেশ আমাদের সবার। দেশের প্রত্যেক নাগরিক সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র হবে সবার। ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার। সংখ্যালঘু বলে কাউকে সঙ্কায়িত না করা হোক, আমরা সবাই বাংলাদেশি। আমাদের চোখে থাকবে দেশ সেবার অদম্য ইচ্ছা শক্তি। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য চাই অনুপ্রাণিত ও অনুকরণীয় নেতৃত্ব যে শুধু স্বপ্ন দেখাবে না স্বপ্ন বাস্তবায়নের তাড়না হয়ে উঠবে।

#

লেখকঃ সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার